International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal
ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)
Volume-II, Issue-V, March 2016, Page No. 22-28
Published by Scholar Publications, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: http://www.ijhsss.com

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়-এর ব্যোমকেশ বক্সীর কাহিনীতে বাঙালির খাদ্যাভাসের প্রতিফলন

ঈশানী চৌধুরী
সহকারী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, বেথুন মহাবিদ্যালয় কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Abstract

The paper brings out the reflections of Bengali Hindu middle class food culture in the Byomkesh Bakshi series of novels and stories composed by famous Bengali author Saradindu Bandyopadhyay in the time period between the 1930s and 1960s. The detective stories of Byaomkeh Bakshi in its process of investigation portrayed various socio-cultural aspects of Bengali middle class lives in the mid-twentieth century. Bengali food habit including the breakfast, daily meal, and family get-together menus – all were depicted in different contexts of the Byomkesh stories. The present article explores the history of Bengali middle class food culture through the prism of Byomkesh Bakshi stories.

Keywords- Bengal, middle class, food habit, twentieth century, breakfast, Byomkesh Bakshi

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়-এর ব্যোমকেশ বক্সীর কাহিনীগুলি বিংশ শতকের বাঙালী সমাজ জীবনের এক আশ্চর্য প্রতিচ্ছবি। গোয়েন্দা গল্পের মোড়কে সমাজের নানাবিধ দিক অপূর্ব দক্ষতায় ফুটিয়ে তুলেছেন লেখক। তা সে কলকাতা শহরের মেসের জীবন-ই হোক বা উচ্চবিত্ত বাঙ্গালী বাড়ির জীবনযাপন। বিংশ শতকের মধ্যভাগের সামাজিক ও দৈনন্দিন জীবনের এক অসাধারণ দলিল এই কাহিনিগুলি। জীবনের চালচিত্রের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হিসেবে বাঙ্গালীর খাওয়া-দাওয়া বা খাদ্যাভ্যাসও অনিবার্যভাবেই এই গল্প গুলিতে প্রতিবিম্বিত হয়েছে। গোয়েন্দা গল্পের রোমহর্ষক উত্তেজনায় কাহিনির পাঠক হয়তো সর্বদা সচেতনভাবে সেই খাদ্যবিবরণী নিয়ে মনোযোগী হন না। কিন্তু খাদ্যসামগ্রী এবং পরিবেশনের মনোগ্রাহী বর্ণনা অবশ্যই তৎকালীন বাঙ্গালী খাদ্যাভাসের এক অপূর্ব চিত্রাঙ্কণ করে। বর্তমান প্রবন্ধটি ব্যোমকেশ বক্সীর গল্পের মাধ্যমে সেই বাঙ্গালী খাদ্যাভাসের প্রতিফলনের উপর বিস্তারিত আলোচনা করবে।

ব্যোমকেশ বক্সীর গল্প উপন্যাস গুলির রচনাকাল ১৯৩০ এর দশক থেকে ১৯৬০ এর দশক। বাঙ্গালী তথা ভারতবাসী এই চার দশক ধরে নানান গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার সাক্ষী থেকেছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ থেকে শুরু করে স্বাধীন ভারতের বিবিধ পরিস্থিতির প্রসঙ্গ ব্যোমকেশ বক্সীর কাহিনীগুলিতে স্থান পেয়েছে। তবে কোনো পরিস্থিতিতেই শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর সত্যান্বেষীকে পুলিশ বা সরকারি গোয়েন্দা হিসেবে উপস্থাপিত করেন নি। ব্যোমকেশ যেন খুব পরিচিত বাঙ্গালী মধ্যবিত্ত ভদ্রলোক। সুকমার সেন শরদিন্দু অমনিবাস-এর ভূমিকায় লিখেছেন, "ডিটেক্টিভগিরি তার জীবিকার্থে নয় সখের, খেয়ালের। তাঁর চরিত্রে মনস্বিতা ও গাম্ভীর্য ছাড়া এমন কিছুই নেই যাতে তাঁকে সমান স্তরের সমান বয়সের বাঙ্গালী ছেলের থেকে স্বতন্ত্র মনে হয়"[1] । আর ঠিক এই কারনেই ব্যোমকেশের দৈনন্দিন অভ্যাস, খাওয়াদাওয়া, ব্যাক্তিগত জীবন প্রভৃতি বাঙ্গালী মধ্যবিত্ত শ্রেণির জীবনযাপন কেই ইঙ্গিত করে। আর তারই সঙ্গে অনুসন্ধান বা সত্যান্বেষণ এর সময় যে সকল ব্যাক্তির সঙ্গে ব্যোমকেশের বা তাঁর সুহৃদ অজিতের পরিচয় ঘটে বিভিন্ন কাহিনিতে তাদের মাধ্যমেও বাঙ্গালী সমাজ জীবনের বিভিন্ন দিকই প্রতিভাত হতে থাকে।

ব্যোমকেশের গল্প উপন্যাসে বিংশ শতকের বাঙ্গালী মধ্যবিত্ত ছেলেদের শিক্ষা ও কর্মের প্রয়োজনে মেস বা হস্টেলে থাকা, মেসের জীবনে নতুন নতুন বন্ধুর সাথে পরিচয় হওয়া, পশ্চিমবঙ্গের বাইরের শহরে বাঙ্গালী ও অবাঙ্গালী সংস্কৃতি, উচ্চবিত্ত বাঙ্গালী বাড়িতে সম্পত্তি সংক্রান্ত দ্বন্দ্ব, বাড়ির ছেলের কলেজ জীবনে রাজনীতির সংস্পর্শে আসা, ধনীগৃহে বিভিন্ন

উপলক্ষ্যে পার্টির বা ভোজসভার আয়োজন, বিভিন্ন উচ্চ-মধ্যবিত্ত পরিবারের ব্যাক্তির তাস-জুয়ার নেশায় আসক্ত হয়ে যাওয়া, ঘরে ঘরে পাচক-ভৃত্যদের উপর ক্রমবর্ধমান নির্ভরশীলতা, ইত্যাদি নানান সামাজিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জানতে পারা যায়। আর এপ্রসঙ্গেই বারংবার উঠে আসে খাদ্যবিলাসী বাঙ্গালীর খাওয়া-দাওয়ার কথা। গৃহস্থ বাড়ির জলখাবার, মেসের খাওয়া-দাওয়া থেকে শুরু করে রেস্তোরা-চা-এর দোকান কি নেই সেখানে! ব্যোমকেশের গল্প-উপন্যাসে বাঙ্গালীর খাদ্যাভাসের এই বিভিন্ন দিক-এর প্রতিবিম্বন বিশ্লেষণ করাই এই প্রবন্ধের লক্ষ্য।

বাঙ্গালীর জলযোগঃ প্রাতঃরাশ, জলখাবার, সান্ধ্যকালীন জলযোগ - এই শব্দগুলি ঔপনিবেশিক যুগের বাংলা প্রবন্ধ ও সাহিত্যে অতি পরিচিত। বিংশ শতকের বাঙ্গালী খাদ্যাভাসের ইতিহাস রচনা করতে গেলে জলখাবারের প্রসঙ্গ উত্থাপিত না হয়েই যায় না। ডাক্তার শ্রীপতিচরণ সরকার তাঁর 'স্বাস্থ্যসোপান'(১৯১৪) গ্রন্থে বলেছেন, "গ্রীষ্মকালে প্রাতে ৬টার সময়, শীতে প্রাতে ৭টার সময় -যাহার যেরূপ জুটিবে সে সেইরূপ আহার করবে। অর্থাৎ চিড়ে, মুড়ি, চালভাজা, কলাইভাজা, মুড়কি, রুটি, সুজি, লুচি ও মিষ্টান্ন ইত্যাদি প্রাতঃরাশরূপে ব্যবহার করা কর্তব্য। প্রাতঃকালের জলযোগের দ্বারা পোষণ ইত্যাদি ক্রিয়া ছাড়াও বসন্ত ইত্যাদি রোগের বিষ সহজে শরীরে ক্রিয়াবান হতে পারে না"[2] ।

তবে উপদেশাবলী যতই থাকুক না কেন, বাঙ্গালীর জলযোগ, বিশেষতঃ শহুরে মধ্যবিত্ত বাঙ্গালীর জলখাবার কিন্তু এই সময় শুধুমাত্র মুড়ি, মুড়কি, চিড়া-গুড়, অথবা ফলাহারে সীমাবদ্ধ ছিল না। কচুরি, কেক, প্যাস্ট্রি, কাটলেট - এর মতো নতুন নতুন মুখরোচক সব খাদ্যসামগ্রী যে বাঙ্গালী খাদ্যতালিকায় প্রবেশ করে গিয়েছে তা বেশ ভালোই বোঝা যায় ব্যোমকেশের গল্প থেকে। ১৯৩০এর দশকের 'সীমন্তহীরা'-য় তাই দেখা যায় ব্যোমকেশকে "অন্যমনস্ক ভাবে কচুরিতে কামড়"[3] দিতে। এই কচুরি-কেন্দ্রিক জলযোগ ১৯৬০এর দশকেও অব্যাহত। 'বেণীসংহার' গল্পে এর প্রায় শেষের দিকে ঝিল্লীর সাথে পরিচারিকাকে দেখা যায় ব্যোমকেশ ও অজিতের জন্য কচুরি-নিমকির প্লেট সাজিয়ে আনতে[4] ।

আজকালকার মতই ডিম তখনো ছিল বাঙ্গালী জলখাবারের এক অপরিহার্য সঙ্গী। 'দুর্গরহস্য' উপন্যাসের উত্তরখন্ডের প্রথম লাইনেই আছে " একদিন কার্ত্তিক মাসের সকালবেলা ব্যোমকেশ ও আমি আমাদের হ্যারিসন রোডের বাসায় ডিম্ব-সহযোগে চা পান শেষ করিয়া খবরের কাগজ লইয়া বসিয়াছিলাম"[5] । আবার 'অমৃতের মৃত্যু' গল্পে বিশ্বনাথ মল্লিকের প্রাতঃরাশের যে বর্ণণা আছে তাতেও রয়েছে "পাউরুটি, মাখন, ও অর্ধসিদ্ধ ডিম"এর উপস্থিতি[6] । রুম নম্বর দুই গল্পের নিরুপমা হোটেলে ম্যানেজার হরিশচন্দ্র বাবু র প্রাতঃরাশেও "চা, টোস্ট মাখন ও দুটি অর্ধসেদ্ধ ডিম"[7] ।

ঔপনিবেশিক যুগের আগে পাউরুটির সাথে বাঙ্গালীর পরিচয় তেমন ছিল না। তবে অনেকে আবার পাউরুটি কে প্রাচীন ভারতে খাদ্যতালিকায় সুপরিচিত কন্দুপক্ক নামক রুটির সাথে "অভিন্ন" বলে মনে করেছেন এই যুগে[8] । এই পাউরুটিকে কেন্দ্র করে কিছু কিছু দ্বিধা দ্বন্দ্ব থাকলেও ক্রমশঃ পাউরুটি বাঙ্গালী বাড়িতে নিজের স্থান করে নিতে থাকে। ১৯৩৭ এ প্রাপ্ত পরিসংখ্যান অনুযায়ী দেখা যায় যে পাউরুটি প্রস্তুতকারক সংস্থা ভারতে, বিশেষতঃ কলকাতায় সেসময় খুব বেশী না থাকলেও স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে এই সংখ্যাটি ক্রমশঃ বৃদ্ধি পায়[9] । উচ্চ ও মধ্যবিত্ত বাঙ্গালীর কাছে তার সমাদর পথ্য হিসেবেও নেহাত কম ছিল না। ব্যোমকেশের কাহিনিতেও এই বক্তব্যের সমর্থন পাওয়া যায়। 'বেণীসংহার'-এ অসুস্থ বেণীমাধব বাবু কে প্রাতঃরাশে চা এর সঙ্গে মেদিনীর হাতে তৈরী করা পাউরুটি টোস্ট খেতে দেখা যায়[10] । চিত্রচোর-এও অসুস্থ ব্যোমকেশকে স্ত্রী সত্যবতী ডাক্তারের পরামর্শানুযায়ী ডালিমের রস, মুর্গীর সুরুয়া র পাশাপাশি পাউরুটি টোস্ট ই খেতে দেন[11] ।

কলকাতা শহরে স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে বেশ কিছু মধ্যবিত্ত পরিবারেই পাচক, ভৃত্য, পরিবেশক প্রমুখ নিত্যকর্ম-সহায়ক পরিচারক বা পরিচারিকা নিয়োজিত থাকতেন। ব্যোমকেশের নিজের গৃহের পুটিরাম, 'শজারুর কাঁটা' গল্পের নকুল এমনই কিছু চরিত্র। প্রাতঃরাশ প্রস্তুত ও পরিবেশনের কাজে এদের উপর পরিবারের নির্ভরশীলতা চোখে পড়ার মতো। আর তাই পুটিরাম শুধু বাজার গিয়ে খাদ্যসামগ্রী যে কিনে আনে তাই নয়, অতিথি এলে চা ও জলখাবার তৈরী করে[12] ; আবার 'শজারুর কাঁটা' গল্পের নকুল গৃহকর্তা দেবাশীষের জন্য নিত্যনতুন প্রাতঃরাশ তৈরী করে, কখনো "লুচিভাজা, আলুর দম, বাড়ীতে তৈরী সন্দেশ"[13], তো আবার কখনো স্যুপ, টোস্ট, স্যালাড[14] । তাসের আড্ডায় এমনই নানান লোভনীয় মুখরোচক জলখাবার তৈরী করে আনে 'কহেন কবি কালিদাস'-এর মোহিনী। মোহিনী কখনো বানাচ্ছে "গরম গরম কাটলেট", আবার কখনো আনছে "মুর্গীর ফ্রাই"[15] । জুয়ার অর্থের প্রলোভন, নারীর আকর্ষণ , উপাদেয় মনমুগ্ধকর খাদ্যের হাতছানি - সব মিলেমিশে একাকার হয়ে যাচ্ছে।

কাহিনীর প্রয়োজনে যখনই শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় ব্যোমকেশ ও অজিতকে কলকাতার বাইরে নিয়ে গেছেন তখন খাবারের কিছু কিছু পরিবর্তনের দিকেও খেয়াল রেখেছেন। ১৯৩৩ সালে লেখা 'চোরাবালি' তে শিকারে রওনা হওয়ার আগে যে প্রাতঃরাশ তাতে রয়েছে কেক। এই গল্পেই পরের দিকে বারান্দায় টেবিল চেয়ার পেতে চা , কচুরি, পাখীর মাংসের কাটলেট ও ডিমের ওমলেট সাজানো হয়েছে জলখাবারে[16]। শৈলরহস্যে আবার মহাবালেশ্বরের সহ্যাদ্রি হোটেলের জলখাবার কফি ও প্যাস্ট্রি[17] । 'বহ্নিপতঙ্গ' কাহিনীতে পাটনায় পুলিশ অফিসার পুরন্দর পান্ডের বাড়ীতে আড্ডায় সান্ধ্যকালীন জলযোগের মেনু "চা, কাবুলি মটরের ঘুঘনী, মনেরের লাড্ডু ও গয়ার তামাক"[18]। আসলে শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় নিজের জীবনে বেশ খানিকটা সময় কলকাতার বাইরে ছিলেন কলকাতার বাইরের বিভিন্ন শহরের প্রচলিত খাদ্যের সম্বন্ধেও সম্যক ধারণা ছিল তাঁর, সেটাই প্রতিফলিত হয়েছে তার রচনায়।

চা-প্রেমী বাঙ্গালীঃ

"হোক না কেবল
শুধু এক কাপ চা
আমার নয়নে
বুনিত স্বপন তা!
খয়ের রঙ্গেতে
ঢালিয়া দুগ্ধ সাদা
চিনি সে মিলাত
কখনো বা দিত আদা![19] "

প্রবোধ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'চা' কবিতার এই লাইনগুলির মাধ্যমে চা এর যে মাহাত্ম্য ফুটে উঠেছে তা আরো একবার জোরালোভাবে প্রকাশিত হয় ব্যোমকেশের গল্পগুলির মধ্যে। বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বাঙ্গালীর চা প্রেম কিরূপ মাত্রায় ছিল তা বোঝা যায় এটা দেখে যে লেখক অধিকাংশ গল্পেই তাঁর সত্যান্বেষীকে চা পানের সুযোগ করে দিয়েছেন। তা সে 'অগ্নিবাণ' গল্পের সকালে ঘুম থেকে উঠেই ব্যোমকেশ অজিতের "চিরন্তন অভ্যাসমতো"[20] একসাথে চা খাওয়াই হোক বা 'মগ্নমৈনাক' গল্পের সত্যান্বেষণে বেরোনোর আগের বিকেল ৪টের সময়ের চা পান[21] ।

বিংশ শতকের প্রথম ভাগে আবার এই চা-কে নিয়ে সাবধানবাণীরও অন্ত ছিল না। বাঙ্গালী ডাক্তার কবিরাজদের লেখাপত্রে আর স্বাস্থ্য, স্বাস্থ্য সমাচার, ইত্যাদি পত্র পত্রিকায় নিয়মিত ভাবে চা কে ঘিরে নানান শঙ্কা, চা-এর অপকারিতা বিষয়ক নানাবিধ তথ্যাদি পরিবেশিত হতো। কবিরাজ ইন্দুভূষণ সেন 'বাঙ্গালীর খাদ্য' গ্রন্থে লিখেছেন, "প্রত্যুষে চা-সেবন পরিপাকশক্তিহীনতার অন্যতম কারণ। চা এর খাদ্য হিসেবে কোনো মূল্য নাই, অথচ অপকারিতা যথেষ্ট। প্রাতে চা-এর পরিবর্তে ঈষদুষ্ণ জলে পাতিলেবুর রস মিশিয়ে পান করলে সকলেই উপকার পাবেন।[22] " ১৯৪২ সালে ডাক্তার যোগেন্দ্রনাথ মৈত্র প্রবেশিকা 'গার্হস্থ্যবিজ্ঞান ও স্বাস্থ্যবিধি' নামক যে গ্রন্থ প্রকাশ করেন তাতেও বলা হয়েছে, "চা এর মধ্যে খাদ্যের উপযোগী কিছুই নেই"[23] । বিখ্যাত বাঙ্গালী রসায়নবিদ আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায় চা পান কে বিষপানের সমতুল্য বলে উল্লেখ করেছিলেন। কিন্তু এতসব সাবধানবাণী সত্ত্বেও বাঙ্গালী বাড়ীতে চা হয়ে উঠেছিল পরম আপন, চা-এর বিজ্ঞাপনে একদা বহুল প্রচারিত শব্দদ্বয় "চুমুকে চমক"-এর জনপ্রিয়তার মতই। অতিথি অভ্যর্থনায় চা-এর গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। 'আমিষ ও নিরামিষ আহার' গ্রন্থের লেখিকা ঠাকুরপরিবারের কন্যা প্রজ্ঞাসুন্দরী দেবী লিখেছেন, "সকলেই অতি তৃপ্তির সহিত চা পান করিয়া থাকে। পূর্বে অতিথি বা আগন্তুককে এক বাটি গরম দুধ কি এক গেলাস মিশ্রির পানা দিয়া অভ্যর্থনা করার রীতি ছিল। কিন্তু আধুনিককালে সে স্থলে এক পেয়ালা চা পান করাতে পারিলে লোকে যেন বেশী তৃপ্তি লাভ করে"[24] । 'মণিমন্ডন' গল্পে যখন ব্যোমকেশ মনিকার রসময় সরকারের বাড়ীতে গিয়েছেন, গৃহকর্তা পুত্রবধূকে আদেশ দেন তাঁদের চা দেওয়ার[25] । ব্যোমকেশও 'উপসংহার' কাহিনীতে বীরেনবাবুর অভ্যর্থনায় চা-এর ব্যাবস্থাই করতে বলেন। "বীরেনবাবুর অভ্যর্থনা করতে চাইলে চা এর আয়োজন চাই; চা সম্বন্ধে তাঁহার এমন একটা অকুণ্ঠ উদারতা আছে যে তুচ্ছ সময়-অসময়ের চিন্তা উহাকে সঙ্কুচিত করতে পারে না"[26] ।

চা এর প্রসঙ্গে ১৯৫৫ সালের 'আদিম রিপু' উপন্যাসের কথা না বললেই নয়। এই কাহিনীতে চা-কে কি কি সহযোগে আরো স্বাদু বা উপাদেয় করে তোলা যায় তারও আলোচনা আছে। ননীবালাদেবী যখন জানিয়েছেন যে চায়ে দেওয়ার দুধ

নেই, তখন ব্যোমকেশের পরামর্শ "দুধের বদলে লেবুর রস চলতে পারে"[27]। তবে সর্বাধিক আলোচনা দেখা গেছে আদাগন্ধী চা এর ব্যাপারে। আদার রস দিয়ে চা খেলে শরীর চাঙ্গা হয়ে উঠবে এমনতর অভিমত শোনা গেছে কেষ্টবাবুর মুখে। "চা এর জলসা"[28] এই শব্দবন্ধটির ব্যাবহারও হয়েছে ব্যোমকেশের গল্পে। 'চিত্রচোর' কাহিনীতে সাঁওতাল পরগণার একটি শহরে গণ্যমান্য এক বাঙ্গালীর বাড়ীতে চা-পার্টি বা চা -জলসা র আয়োজন চোখে পড়ার মতো[29]। ট্রেনের অপেক্ষায় বসে থাকা যাত্রীদের চা পানের সুযোগ করে দেওয়ার জন্যই বিভিন্ন স্টেশনে ছিল চা এর স্টল। 'অমৃতের মৃত্যু' গল্পে এমনই এক স্টলে চা খেতে দেখা যায় ব্যোমকেশদের[30]। অর্থাৎ বাঙ্গালীর রোজকার জীবনে নানান মুহূর্তের সাথী হয়ে উঠছিল চা, সকালের ঘুম থেকে ওঠা থেকে অতিথি অভ্যর্থনা পর্যন্ত্য চা হয়ে উঠছিল জীবনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ।

রকমারি খাদ্যের আয়োজনঃ

> "দীপা আজ নকুলের সাহায্যে অনেক রকম খাবার তৈরী করেছিলঃ চিংড়ী মাছের কাটলেট, হিঙ-এর কচুরি, ডালের ঝালবড়া, রাঙালুর পুলি, জমাট ক্ষীরের বরফি ইত্যাদি।[31]"

'শজারুর কাঁটা'-র এই খাদ্যতালিকার মতই আরো বহু রকমারি খাদ্যের আয়োজন হতে দেখা গেছে ব্যোমকেশের অপরাপর গল্প-উপন্যাসে। প্রবন্ধের এই অংশে বাঙ্গালীর খাবারের সেই বৈচিত্র্য নিয়েই আলোচনা করা হবে। বাঙ্গালীর মধ্যাহ্ন বা নৈশভোজের তালিকা যে সর্বদাই নানাবিধ খাদ্যের সমাহারকেই প্রতিফলিত করে সেকথা নতুন করে বলার অপেক্ষা রাখে না। ব্যোমকেশের গল্পেও সেই বক্তব্যেরই পুনরাবৃত্তি হতে দেখি। আর তাই গল্পের সেই খাদ্যতালিকায় চোখ রেখে কি কি খাবার বিংশ শতকের মধ্যভাগের সময়কালে বাঙ্গালী মধ্যবিত্ত মহলে অধিকতর জনপ্রিয় ছিল তার ধারণা পাওয়া যেতে পারে।

রকমারি খাবারের কথায় 'বেণীসংহার' কাহিনীর আলোচনা অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। বেণীমাধব বাবু তাঁর খাদ্যে বিষক্রিয়ার খবর জানতে পেরে কন্যা ও পুত্রবধুর কাছ থেকে রান্নার দায়িত্ব সরিয়ে নেন এবং খাসচাকর মেঘরাজকে নির্দেশ দেন শীঘ্রই তাঁর স্ত্রীকে রান্নাবান্নার কাজের নিমিত্তে নিয়ে আসার। সেইকয়দিনের জন্য আপাত যে বন্দোবস্তের কথা বলেছিলেন তাতে এক লম্বা তালিকা দেখতে পাওয়া যায় যাকে লেখক 'সাত্ত্বিক' আহার বলেছেন। সেই তালিকায় দই, কড়াপাকের সন্দেশ, পাউরুটি, মাখন, মারমালেড, টিনের দুধ, আঙ্গুর, আপেল সমস্তকিছুই উল্লিখিত হয়েছে[32]। এপ্রসঙ্গে উল্লেখ্য, টিনের দুধ-এর জনপ্রিয়তা বাঙ্গালী খাদ্যাভাসে একেবারেই বিংশ শতকের বিষয়। উনিশ শতকের শেষার্ধে ও বিংশ শতকের সূচনায় টিনের দুধ নিয়ে বাঙ্গালী ভদ্রলোকদের মধ্যে যতই মতান্তর থাকুক না কেন ক্রমে ভেজাল জল-মিশ্রিত দুধের আধিক্যে গরু-ছাগলের দুধ অপেক্ষা অনেকেই টিনের দুধকে নিরাপদ বলে বেছে নিয়েছিলেন; এটি ফ্রিজে থাকলে অধিক দিন ব্যাবহারোপযোগী থাকত বলেও এর চাহিদা বৃদ্ধি পায়।

রকমারি খাবারের বর্ণণায় এক অনন্য মাত্রা সংযুক্ত করেছিল ব্যোমকেশ-এর বিভিন্ন গল্পে কলকাতা শহরের বাইরের বিভিন্ন অঞ্চলের গন্যমাণ্য ব্যাক্তির বাড়িতে আয়োজিত ভোজের নিমন্ত্রণ। এরকমই নিমন্ত্রনের প্রসঙ্গে 'বহ্নিপতঙ্গ'-তে পাটনায় পুলিশ অফিসার পুরন্দর পাণ্ডের বাড়িতে "মুর্গীর কাশ্মীরী কোর্মা"[33] সম্বলিত নৈশভোজের কথা ওঠে ; যদিও অপর একটি নিমন্ত্রণ এসে যাওয়ায় সেই কাশ্মীরি কোর্মার নিমন্ত্রণ রক্ষা করা আর হয়ে ওঠে নি ব্যোমকেশের। যে নিমন্ত্রণটি রক্ষা করতে তাদের যেতে হয়েছিল সেটি ছিল পাটনার গণ্যমান্য জমিদার দীপনারায়ণ সিং-এর বাড়ীর নৈশভোজের নিমন্ত্রণ। হল-ঘরে টেবিল পেতে, কলকাতার 'বিলাতী হোটেল থেকে পাচক - পরিবেশক' আনিয়ে যে বিপুল 'রাজকীয়' আয়োজনের[34] উল্লেখ পাওয়া যায় তাতে বোঝা যায় যে কলকাতার বাইরে ধনী পরিবারের মধ্যে এই ধরনের ভোজ-এর প্রচলন-এর মধ্যে সকলের সঙ্গে কুশল বিনিময়ের উদ্দেশ্যে ও সম্পদ-ঐশ্বর্য প্রদর্শনের বাসনা মিলেমিশে একাকার হয়ে ছিল। এরকমই অপর এক ভোজসভার উল্লেখ আছে 'চিত্রচোর' কাহিনিতে। সেই আয়োজন সম্পর্কে বলা হয়েছে-

> "ইতিমধ্যে কয়েকজন ভৃত্য বাড়ীর ভিতর হইতে বড় বড় ট্রে-তে করিয়া নানাবিধ খাদ্য-পানীয় আনিয়া টেবিল গুলির উপর রাখিতে ছিল; চা, কেক, সন্দেশ, পাপড়ভাজা, ডালমুট ইত্যাদি।"[35]

ভৃত্য দ্বারা খাদ্য আনীত হলেও এইসমস্ত বড় ভোজসভায় প্রথা ছিল যে গৃহকর্ত্রী নিজে অতিথিদেরকে খাদ্য পরিবেশন করতেন অধিকাংশ সময়ে। ভৃত্য দ্বারা পরিবেশন অনেকক্ষেত্রেই অসম্মানজনক বলে বিবেচিত হত। এই গল্পে তাই দেখা গেছে গৃহকর্তার মেয়ে রজনী অতিথিদের খাদ্য পরিবেশন করেছেন নিজে[৩৬]।

খাদ্যের আয়োজন নিয়ে যখন কথা হচ্ছে তখন রান্নার ও রান্নাঘরের সরঞ্জামের উল্লেখ যে থাকবে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। ঔপনিবেশিক যুগের দ্বিতীয়ার্ধের বাঙ্গালী রান্নার জগতে এমনই এক পরিচিত সরঞ্জামের নাম ইকমিক কুকার। ইন্দুমাধব মল্লিকের তৈরী এই কুকার বাঙ্গালী হেঁসেলে বিশেষতঃ বাঙ্গালী পুরুষের রান্নার এক অনবদ্য সঙ্গী হয়ে উঠেছিল। লেখক বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় (বনফুল) তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন বউবাজার স্ট্রীটের ডায়মণ্ড বোর্ডিং হাউসে থাকাকালীন ইকমিক কুকার কিভাবে তাঁর রান্নাবান্নার নিত্য সঙ্গী হয়ে গিয়েছিল।

> "আমি একটি ছোট ইকমিক কুকার বসাইবার জন্য একটি ছোট স্ট্যান্ড এবং একটি টেবিল কিনিয়া ফেলিলাম। পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম ইকমিকে ভাত ও মাংস সুসিদ্ধ হইতে প্রায় দুই-ঘণ্টা সময় এবং তিন আউন্স কেরোসিন তেল লাগে। বোর্ডিং এর চাকর রোজ মাংস, তরি-তরকারি কিনিয়া আনিত। কিছু গুড়া মশলা, ঘি, তেল, একটি ছোট কড়া, খুনতি এবং একটি ছোট প্রাইমাস স্টোভও কিনিলাম। স্টোভে মশলা ভাজিয়া দধি সহযোগে মাংসটা কিঞ্চিত কষিয়া লইয়া তাহার পর ইকমিকে চড়াইতাম। ভোরে ৭টার আগেই ইকমিক ঠিক করিয়া জুয়েল ল্যাম্পে সাড়ে-তিন আউন্স তেল দিয়া ল্যাম্পটি জ্বালিয়া ইকমিক চড়াইয়া কলেজে চলিয়া যাইতাম। ... বোর্ডিং এ ফিরিতাম বেলা ১২ টা নাগাদ। দেখিতাম জুয়েল ল্যাম্পের আলো নিভিয়া গিয়াছে। ইকমিকে গরম মাংস ভাত প্রস্তুত হইয়া অপেক্ষা করিতেছে[৩৭]"

ব্যোমকেশ বক্সীর উপন্যাস 'দুর্গরহস্য'তেও রান্নার সাজ-সরঞ্জামের মধ্যে রয়েছে সেই ইকমিক কুকার। সত্যান্বেষণের তাগিদে ব্যোমকেশ ও অজিত যখন দুর্গে থাকতে গেলেন তাদের সঙ্গে তখন বিছানা বাক্স, চাল, ডাল আনাজ ছাড়াও ছিল একটি ইকমিক কুকার। এবং সেই কুকারে রান্না হওয়া খাবারের দুর্দান্ত প্রশংসা শোনা গেছে লেখকের লেখনীতে। "ঘরে গিয়া আহারে বসিলাম। ইকমিক কুকারে রাঁধা খিচুড়ি এবং মাংস যে এমন অমৃততুল্য হইতে পারে তাহা জানা ছিল না। তার উপর সীতারাম ওমলেট ভাজিয়াছে। গুরুভোজন হইয়া গেল"।[৩৮] ইকমিক কুকার ছাড়াও স্টোভ ও ফ্রিজ-ও যে বাঙ্গালী জীবনে খাদ্য আয়োজনের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গে পরিণত হয়েছে তাও শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই সাহিত্যসৃষ্টি থেকে ধারণা করা যায়। 'বেণীসংহার' এ ব্যোমকেশ বেণীমাধব ও মেঘরাজ খুনের তদন্তে এসে ফ্রিজে থাকা খাদ্যসামগ্রীও পর্যবেক্ষণ করেছেন। এবং দেখেছেন যে ফ্রিজে "নানা জাতের ফলমূল, সারি সারি ডিম মাছ, মাংস, দুধের বোতল আছে"[৩৯]।

হোটেল-রেস্তোরাঃ হোটেলের খাওয়াদাওয়ার বিষয়টি ঔপনিবেশিক যুগের শেষভাগে কলকাতার চালচিত্রে এক নবতম সংযোজন বলা চলে। বাঙ্গালী মধ্যবিত্ত লেখক, চিকিৎসক মহলে এই হোটেলের খাওয়া নিয়ে বিপুল সমালোচনার ঝড় উঠলেও এই হোটেল-রেস্তোরার হাতছানি বাঙ্গালী কখনই পুরোপুরি অস্বীকার করতে পারে নি। তাই মেসের বাসিন্দা কলকাতার যুবসম্প্রদায়, কলেজছাত্র, থেকে শুরু করে গৃহস্থ বাঙ্গালী মধ্যবিত্তকেও হোটেলে বা রেস্তোরায় খাদ্য গ্রহণ করতে দেখা যায় কখনো নিছক নতুন নতুন খাবারের স্বাদ গ্রহণের আগ্রহে আবার কখনো অপরিচিত শহরে পরিবার-পরিজনদের থেকে দূরে দৈনন্দিন জীবনযাপনের প্রক্রিয়ায় বাধ্য হয়ে। এরকমই হোটেলের খাওয়াদাওয়ার অভ্যাসের বিবরণ পাওয়া যায় 'শজারুর কাঁটা' উপন্যাসে, যেখানে উচ্চ-মধ্যম শ্রেণীর শিক্ষিত যুবক সুজন মিত্র তাঁর একাকী জীবনে হোটেলে খাওয়াকেই বেছে নিয়েছেন।

> "সুজন হোটেলেই খায়। তার বাসায় রান্নার আয়োজন নেই। কিন্তু রোজ একই হোটেলে খায় না, যখন যা খাবার ইচ্ছা হয় তখন সেই রকম হোটেলে খায়। কখনো বা মিষ্টান্ন দোকানে গিয়ে দই-সন্দেশ খেয়ে পেট ভরায়।"[৪০]

ব্যোমকেশ বক্সী ও অজিত কেও এমনি এক হোটেলে প্রবেশ করতে দেখা গেছে ১৯৫৫ সালের 'আদিম রিপু' গল্পে। শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিঁখুত বর্ণণায় ছবির মতো ফুটে ওঠে সেই হোটেল যেখানে সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে দোতলায়

ম্যানেজারের সাক্ষাত মেলে, আর দেখা যায় ছোট ছোট কুঠুরিতে টেবিল পেতে খেতে বসার আয়োজন। কাহিনির অন্যতম প্রধান চরিত্র কেষ্টবাবু কে এই হোটেলটিতেই 'রাজসিক' খাদ্যগ্রহণে প্রবৃত্ত হতেও দেখা যায়।

> "পর্দার ফাঁক দিয়া দেখা যাইতেছে কেষ্টবাবু একাকী আহার করিতেছেন। তাহার সামনে শ্বেতবস্ত্রাবৃত টেবিলের উপর অনেকগুলি প্লেটে রাজসিক খাদ্যদ্রব্য সাজানো। একটি প্লেটে আস্ত রোস্ট মুর্গী উত্তানপাদ অবস্থায় বিরাজ করিতেছে। পাশে একটি বোতল।"[4 1]

হোটেলের এই খাওয়াদাওয়ার বর্ণণার মাধ্যমে ব্যোমকেশের কাহিনির মাধ্যমে বাঙ্গালী খাদ্যাভাসের চিত্রাঙ্কন আরও প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে। বোঝা যায় বাঙ্গালীর খাদ্যাভাসের ঐতিহ্য বা নতুনত্ব কোনো কিছুই কাহিনিকারের দৃষ্টি এড়ায় নি।

পরিশেষেঃ পরিশেষে একথা বলা যায় যে বিংশ শতকের মধ্যভাগের বাঙ্গালীর খাদ্যাভাসের বিবরণ যেসকল সাহিত্যের মধ্য দিয়ে প্রতিফলিত হয়েছে তার মধ্যে শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের ব্যোমকেশের রচনাগুলি অন্যতম। রোজকার জলখাবারে বাঙ্গালী মধ্যবিত্ত বাড়ীতে কি খাওয়া হোত, অতিথিসেবা-য় কি ধরনের খাবার পরিবেশিত হোত, চা-পানের প্রতি আগ্রহ কিভাবে বাড়ছিল, - এই সমস্তই এই কাহিনিগুলিতে অত্যন্ত নিপুণভাবে অথচ গল্পের গতিকে বিন্দুমাত্র বিলম্বিত বা বাধাপ্রাপ্ত না করে বর্ণিত হয়েছে। বাঙ্গালীর খাদ্যাভাসের ইতিহাস রচনায় বিভিন্ন ঐতিহাসিক উপাদানের পাশাপাশি সাহিত্যিক উপাদানের মধ্যে এই ব্যোমকেশের গল্প-উপন্যাসের গুরুত্ব কখনই উপেক্ষণীয় নয়।

তথ্যসূত্র

[1] সুকুমার সেন, শরদিন্দু অমনিবাস, ভূমিকা, কলকাতা, আনন্দ, ১৪১১ (প্রথম সং- ১৩৭৭)

[2] শ্রীপতিচরণ সরকার, স্বাস্থ্যসোপান, কলকাতা, ১৯১৪, পৃ ৩১-৩২

[3] শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, 'সীমন্তহীরা', শরদিন্দু অমনিবাস, প্রথম খন্ড, কলকাতা, আনন্দ, ১৪১১ (প্রথম সং- ১৩৭৭)পৃ ৬৯

[4] শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, 'বেণীসংহার', শরদিন্দু অমনিবাস, দ্বিতীয় খন্ড, কলকাতা, আনন্দ, ১৪০৬ (প্রথম সং- ১৩৭৮)পৃ ৫৯১

[5] শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, 'দুর্গরহস্য', শরদিন্দু অমনিবাস, প্রথম খন্ড, পৃ ৩০৭

[6] শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, 'অমৃতের মৃত্যু', শরদিন্দু অমনিবাস, দ্বিতীয় খন্ড, পৃ ২৩৭

[7] শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, 'রুম নম্বর দুই', শরদিন্দু অমনিবাস, দ্বিতীয় খন্ড, পৃ ৪৫৪

[8] চক্রধর সাহা, 'পাউরুটি', স্বাস্থ্য সমাচার, ভাদ্র, ১৩২৭, পৃ ১০০

[9] K.T. Achaya, *The Illustrated Foods of India*, New Delhi, Oxford University Press, pp 196-197

[10] শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, 'বেণীসংহার', শরদিন্দু অমনিবাস, দ্বিতীয় খন্ড, পৃ ৫৬৭

[11] শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, 'চিত্রচোর', শরদিন্দু অমনিবাস, প্রথম খন্ড, পৃ ২৫৭

[12] শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, 'উপসংহার', শরদিন্দু অমনিবাস, প্রথম খন্ড, পৃ ১৮৭

[13] শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, 'শজারুর কাঁটা', শরদিন্দু অমনিবাস, দ্বিতীয় খন্ড, পৃ ৪৯০

[14] শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, 'শজারুর কাঁটা', শরদিন্দু অমনিবাস, দ্বিতীয় খন্ড, পৃ ৫২২

[15] শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, 'কহেন কবি কালিদাস', শরদিন্দু অমনিবাস, দ্বিতীয় খন্ড, পৃ ২৮৮-২৮৯

[16] শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, 'চোরাবালি', শরদিন্দু অমনিবাস, প্রথম খন্ড, পৃ ১৪৭

[17] শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, 'শৈলরহস্য', শরদিন্দু অমনিবাস, দ্বিতীয় খন্ড, পৃ ২৪৬

[18] শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, 'বহ্নিপতঙ্গ'', শরদিন্দু অমনিবাস, দ্বিতীয় খন্ড, পৃ ১০৩

[19] প্রবোধ বন্দ্যোপাধ্যায়, চা, ভারতবর্ষ, আশ্বিন, ১৩৪৭

[20] শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, 'অগ্নিবাণ', শরদিন্দু অমনিবাস, প্রথম খন্ড, পৃ ১৬২

[21] শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, 'মগ্নমৈনাক', শরদিন্দু অমনিবাস, দ্বিতীয় খন্ড, পৃ ৪১৪

[22] কবিরাজ ইন্দুভূষণ সেন, বাঙ্গালীর খাদ্য, কলকাতা, আরোগ্য নিকেতন, ১৯২৮, পৃ ৭৩

[23]ডাক্তার যোগেন্দ্রনাথ মৈত্র, প্রবেশিকা গার্হস্থ্যবিজ্ঞান ও স্বাস্থ্যবিধি, কলকাতা, ১৯৪২, পৃ ১০১
[24] প্রজ্ঞাসুন্দরী দেবী, আমিষ ও নিরামিষ আহার, দ্বিতীয় খন্ড (আমিষ), কলকাতা, আনন্দ , ২০০৭ (প্রথম প্রকাশ ১৯০৭)পৃ ৪৩০
[25] শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, 'মণিমন্ডন', শরদিন্দু অমনিবাস, দ্বিতীয় খন্ড, পৃ ১৮৯
[26] শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, 'উপসংহার', শরদিন্দু অমনিবাস, প্রথম খন্ড, পৃ ১৮৭
[27] শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, 'আদিম রিপু', শরদিন্দু অমনিবাস, দ্বিতীয় খন্ড, পৃ ৮২
[28] শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, 'চিত্রচোর', শরদিন্দু অমনিবাস, প্রথম খন্ড, পৃ ২৬৪
[29] ঐ পৃ ২৫৮
[30] শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, 'অমৃতের মৃত্যু', শরদিন্দু অমনিবাস, দ্বিতীয় খন্ড, পৃ ২৩৫
[31] শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, 'শজারুর কাঁটা', শরদিন্দু অমনিবাস, দ্বিতীয় খন্ড, পৃ ৫২৬
[32] শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, 'বেণীসংহার', শরদিন্দু অমনিবাস, দ্বিতীয় খন্ড, পৃ ৫৬৭
[33] শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, 'বহ্নিপতঙ্গ'', শরদিন্দু অমনিবাস, দ্বিতীয় খন্ড, পৃ ১০৫
[34] ঐ, পৃ ১১১
[35] শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, 'চিত্রচোর', শরদিন্দু অমনিবাস,প্রথম খন্ড, পৃ ২৬১
[36] ঐ
[37] বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় (বনফুল), পশ্চাদপট, কলকাতা, বানীশিল্প, ১৯৭৮, ১১৪-১১৫
[38] শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, 'দুর্গরহস্য', শরদিন্দু অমনিবাস, প্রথম খন্ড, পৃ ৩২৯-৩৩০
[39] শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, 'বেণীসংহার', শরদিন্দু অমনিবাস, দ্বিতীয় খন্ড, পৃ ৫৭৪
[40]শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, 'শজারুর কাঁটা', শরদিন্দু অমনিবাস, দ্বিতীয় খন্ড, পৃ ৫৩৪
[41] শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, 'আদিম রিপু', শরদিন্দু অমনিবাস, দ্বিতীয় খন্ড, পৃ ৭৬-৭৭

গ্রন্থপঞ্জি

1. Achaya, K.T. *The Illustrated Foods of India,* New Delhi, Oxford University Press, 2009
2. দেবী, প্রজ্ঞাসুন্দরী, আমিষ ও নিরামিষ আহার, দ্বিতীয় খন্ড, কলকাতা, আনন্দ, ২০০৭ (প্রথম প্রকাশ ১৯০৭)
3. গুপ্ত, প্রতুলচন্দ্র, সম্পাদিত শরদিন্দু অমনিবাস, প্রথম খন্ড ব্যোমকেশ, কলকাতা, আনন্দ, ১৪১১ (প্রথম সং ১৩৭৭)
4. গুপ্ত, প্রতুলচন্দ্র, সম্পাদিত শরদিন্দু অমনিবাস, দ্বিতীয় খন্ড ব্যোমকেশ, কলকাতা, আনন্দ, ১৪০৬ (প্রথম সং ১৩৭৮)
5. বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রবোধ, চা, ভারতবর্ষ, আশ্বিন, ১৩৪৭
6. মুখোপাধ্যায়, বলাইচাঁদ, পশ্চাদপট, কলকাতা, বানীশিল্প, ১৯৭৮
7. মৈত্র, ডাক্তার যোগেন্দ্রনাথ, প্রবেশিকা গার্হস্থ্যবিজ্ঞান ও স্বাস্থ্যবিধি, কলকাতা, ১৯৪২
8. সরকার, শ্রীপতিচরন, স্বাস্থ্যসোপান, কলকাতা, ১৯১৪
9. সাহা, চক্রধর, 'পাউরুটি', স্বাস্থ্য সমাচার, ভাদ্র, ১৩২৭, পৃ ১০০
10. সেন, কবিরাজ ইন্দুভূষণ, বাঙ্গালীর খাদ্য, কলকাতা, আরোগ্য নিকেতন, ১৯২৮